ব্যাপ্তির একবিংশতি প্রকার লক্ষণ: গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের দৃষ্টিতে একটি পর্যালোচনা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পি.এইচ.ডি. (আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ

গবেষক

বুদ্ধদেব চ্যাটার্জ্জী

তত্ত্বাবধায়ক

ড.দীপায়ন পট্টনায়ক

অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

দর্শন বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২

২০২৪

ব্যাপ্তির একবিংশতি প্রকার লক্ষণ: গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের দৃষ্টিতে একটি পর্যালোচনা

ভূমিকাঃ

মানব সভ্যতা একবিংশ শতকে পদার্পণ করেছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের নব নব ক্ষেত্র উন্মোচিত হয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত। প্রযুক্তির উন্নতি ঘটিয়ে যাপিত জীবনকে সহজ ও সমৃদ্ধ করে তুলতে বিজ্ঞানীকুল এখন তৎপর। প্রাযুক্তিক উন্নতির এই মহাযজ্ঞে যখন প্রায় সকলেই সামিল তখন অনুমানের অঙ্গ হিসাবে ব্যাপ্তির আলোচনা বা তার উপর গবেষণাকর্ম একান্ত জীবনবিমুখ অনাকর্ষণীয় একটি চর্চা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। অথচ সামান্য বিবেচনা করে দেখলে ধরা পড়ে যে, এই বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পথটি আসলে অনুমানের পথ। লৌকিক জীবনযাত্রা থেকে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত, বৈজ্ঞানিক কৃৎকৌশল আবিষ্কার থেকে নিত্যনতুন প্রযুক্তির সন্ধান যে পথে পরিচালিত হয় সেটা প্রায় ক্ষেত্রেই অনুমান নির্ভর। বস্তুত মানব জ্ঞানরাজ্যের অধিকাংশটাই দখল করে আছে অনুমান। প্রত্যক্ষ বা নিরীক্ষণের মাধ্যমে যা লব্ধ হয় তার শ্রেষ্ঠত্ব সর্বসম্মত; কিন্তু প্রকৃতির গূঢ় রহস্য অনুসন্ধানে সেই প্রত্যক্ষলব্ধ তথ্য একান্তই অপ্রতুল। প্রকৃতি-রহস্যের অবগুণ্ঠন উন্মোচনের অন্যতম চাবিকাঠি যে অনুমান তা আমাদের মেনে নিতেই হয়। এই অনুমান নির্ভর করে প্রকৃতির রাজ্যে অব্যাহত কিছু সার্বত্রিক নিয়মের জ্ঞানের উপর। এই সার্বত্রিক নিয়মই হল ব্যাপ্তি। অদৈশিক, অকালিক এই নিয়ম বা ব্যাপ্তিকে অবলম্বন করেই দৈশিক, কালিক ঘটনাগুলি সংঘটিত হয়। তাই বিজ্ঞানীকুল সতত নিয়োজিত থাকেন ওই সার্বিক নিয়মগুলির সন্ধানে। এই সার্বিক, প্রাকৃতিক নিয়মগুলির জ্ঞান তাদের প্রশয় দেয় ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্বন্ধে সফল পূর্বাভাস করতে এবং সেইসঙ্গে

ভাবী পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি নিতে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ব্যবহারিক জীবনযাত্রা থেকে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সকলই অনুমান তথা তার ঘটক নিয়ম অর্থাৎ ব্যাপ্তিজ্ঞানের অপেক্ষা রাখে।

দর্শন সাহিত্যের ইতিহাসে অনুমান তথা ব্যাপ্তির অলোচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। ভারতীয় দর্শনের প্রতি দৃক্‌পাত করলে স্পষ্ট হয় যে প্রতিটি দর্শন অট্টালিকার ন্যায় চারটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত – প্রমাণ, প্রমেয়, প্রমাতা ও প্রমিতি। প্রমেয়তত্ত্বের স্বরূপ নিরূপণ কল্পে প্রায় প্রতিটি দর্শন প্রমাণের সহায়তা গ্রহণ করে, যেগুলির মাধ্যমে প্রমাতার মধ্যে প্রমিতি উৎপন্ন হয়। প্রমিতি বা প্রমাজ্ঞানের উপায় এই প্রমাণের সংখ্যা বিষয়ে ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলির মতৈক্য পরিলক্ষিত হয় না; তবে চার্বাক ভিন্ন প্রায় সকল সম্প্রদায় প্রমাণ হিসাবে অনুমানকে স্বীকার করে থাকে। প্রত্যক্ষ প্রমাণের জ্যেষ্ঠত্ব সম্প্রদায়গুলির দ্বারা সমর্থিত হলেও জ্ঞানের অগ্রগতি যে বহুলাংশে অনুমান নির্ভর তা তাঁরা মানেন। তাই অনুমানের যথার্থতা নিশ্চয়ের লক্ষ্যে গভীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হন ভারতীয় দার্শনিকরা। এই অনুমান বস্তুত দৃষ্ট লিঙ্গের সাহায্যে অ-দৃষ্ট লিঙ্গীর অস্তিত্ব বিষয়ে পরোক্ষ জ্ঞান। দৃষ্ট থেকে অদৃষ্টের এই জ্ঞান দৃষ্ট ও অ-দৃষ্টের, লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ জ্ঞান ছাড়া সম্ভব হয় না। তাই লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধের স্বরূপ সন্ধান ভারতীয় প্রমাণ শাস্ত্রে অত্যধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। এই লিঙ্গ-লিঙ্গী সম্বন্ধের নামকরণ সব দর্শনে একভাবে হয়নি। তা সত্ত্বেও সম্বন্ধটির লক্ষণ নিরূপণ এবং ওই সম্বন্ধটিকে জ্ঞানগোচর করার উপায় সন্ধান প্রতিটি দর্শনে সমধিক গুরুত্ব পেয়েছে।

ভারতীয় দর্শনের যে সম্প্রদায়ের কাছে প্রমাণ শাস্ত্রের আলোচনা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল ন্যায়দর্শন। ন্যায়শাস্ত্রের প্রবক্তা অক্ষপাদ যে ষোড়শ তত্ত্বের জ্ঞান

হতে নিঃশ্রেয়স লাভের পথ নির্দেশ করেছেন সেই তত্ত্বসমূহের প্রধান ও প্রথমটি হল প্রমাণ। এই প্রমাণ নৈয়ায়িক মতে চতুর্বিধ – প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। প্রমাণ চতুর্বিধ হলেও স্বপক্ষ সাধন ও পরপক্ষ বাঁধনের অন্যতম উপায় হিসাবে মূলত অনুমানেরই শরণাপন্ন হয়েছেন নৈয়ায়িক সম্প্রদায়। তাই অনুমানের গুরুত্ব ন্যায় দর্শনে অপরিসীম। শুধু অ-দৃষ্ট বিষয়ের স্বরূপ নিরূপণ নয় দৃষ্ট ঘটনার যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়েও তাঁরা যেমন অনুমানের সাহায্য নিয়েছেন তেমনই যেকোনো জ্ঞানের প্রামাণ্য, অপ্রামাণ্য নির্ধারণের উপায় হিসেবে অনুমানের আশ্রয় নিয়েছেন নৈয়ায়িকরা। এই অনুমানের যৌক্তিক ভিত্তি হল লিঙ্গ-লিঙ্গী সম্বন্ধের জ্ঞান। তাই অনুমানের আলোচনা প্রসঙ্গে লিঙ্গ-লিঙ্গী সম্বন্ধের স্বরূপ বিশ্লেষণই বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে ন্যায়দর্শনে। দর্শনভেদে এই সম্বন্ধ নানা নাম পেলেও ন্যায় ঐতিহ্যে মূলত ‘ব্যাপ্তি’ নামে অভিহিত হয়েছে এই সম্বন্ধটি। এই অনুমান তথা ব্যাপ্তির আলোচনা তার নিরতিশয় রূপ লাভ করেছে নব্য নৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের “তত্ত্বচিন্তামণি”র অনুমান খণ্ডে। বর্তমান গবেষণার মুখ্য অভিমুখ গঙ্গেশকৃত “তত্ত্বচিন্তামণি”র অন্তর্গত ব্যাপ্তি বিষয়ক আলোচনা। ন্যায় মত অনুসরণ করে ব্যাপ্তির একটি গ্রহণযোগ্য লক্ষণ সন্ধান করেছেন মণিকার। তাঁর বিচারে যেটি সর্বোৎকৃষ্ট লক্ষণ হতে পারে, তার এক জটিল ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা পেশ করেছেন ‘সিদ্ধান্তলক্ষণ’ শীর্ষক পরিচ্ছেদে। ওই সিদ্ধান্তলক্ষণ উপন্যাসের পূর্বে ‘ব্যাপ্তিবাদ’ নামক পরিচ্ছেদে ব্যাপ্তি বিষয়ে পূর্বপক্ষী প্রদত্ত অনেকগুলি লক্ষণ বিচার করে তাদের অসারতাও প্রদর্শন করেছেন গঙ্গেশ। ওই লক্ষণগুলির ব্যাখ্যা, বিচার এবং তাদের বিরুদ্ধে গঙ্গেশ উত্থাপিত আপত্তিসমূহ পর্যালোচনায় এই গবেষণাকর্মে স্থান পেয়েছে। ‘ব্যাপ্তিবাদ’-এ যে লক্ষণগুলি গঙ্গেশ দ্বারা নিরাকৃত হয়েছে সেগুলির মধ্যে রয়েছে ‘অব্যভিচরিতত্ব’ পদপ্রতিপাদ্য পঞ্চ ব্যাপ্তিলক্ষণ ও ‘সিংহ-ব্যাঘ্র’ লক্ষণদ্বয়।

এছাড়াও ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকঅভাবের ধারণাকে মান্যতা দিয়ে সৌন্দড় উপাধ্যায় অব্যভিচার রূপ ব্যাপ্তির লক্ষণগুলিকে সমর্থন করতে গিয়ে যেসব যুক্তির অবতারণা করেছেন, সেই সকল যুক্তির নিরাকরণও স্থান পেয়েছে ওই পরিচ্ছেদে। দীধিতিকার রঘুনাথ 'অব্যভিচার' শব্দটির সৌন্দড়াদি সম্মত নানাবিধ অর্থের কল্পনা করেছেন তাঁর রচনায়। যার ফল স্বরূপ পূর্বপক্ষী সম্মত সপ্তবিধ লক্ষণের অতিরিক্ত চতুর্দশ প্রকার লক্ষণের উদ্ভব হয়েছে। সাকুল্যে ওই একবিংশতি (৭+১৪) লক্ষণের ব্যাখ্যা, বিচার ও মুল্যায়ন বর্তমান গবেষণায় স্থান পেয়েছে। সমগ্র গবেষণা নিবন্ধটিকে সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। ওই সব অধ্যায় ও তাদের বিষয়বস্তুর উপর সংক্ষেপে আলোকপাত করা যাক।

প্রথম অধ্যায়ঃ অনুমিতিতে ব্যাপ্তির ভূমিকা

সঙ্গতিহীন আলোচনা কোনো শাস্ত্রই অনুমোদন করে না। বিশেষত ন্যায় শাস্ত্রে অপ্রাসঙ্গিক কোনো আলোচনা কখনই স্থান পেতে পারে না। কাজেই আলোচ্য গবেষণা নিবন্ধে ঠিক কী কারণে ব্যাপ্তি জ্ঞানের আলোচনা স্থান পেয়েছে তা স্পষ্ট করা দরকার। ন্যায়সম্মত প্রমাণ চতুষ্টয়ের মধ্যে অন্যতম দ্বিতীয়টি হল অনুমান। এই অনুমান হল অনুমিতির করণ। জ্ঞাত লিঙ্গের দর্শন থেকে অজ্ঞাত লিঙ্গী বিষয়ক এই অনুমিতি যৌক্তিকভাবে নির্ভর লিঙ্গ ও লিঙ্গীর একটি নিয়ত, অব্যভিচারী, অনৌপাধিক সম্বন্ধের উপর। এই সম্বন্ধটি হল ব্যাপ্তি। ব্যাপ্তি জ্ঞান ব্যতীত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতা জ্ঞান বা পরামর্শ জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে না। আর পরামর্শ ব্যতীত অনুমিতি সম্ভব হয় না। বস্তুত পরামর্শজন্য জ্ঞান রূপেই অনুমিতির পরিচয়। এই পরামর্শ জ্ঞানে ব্যাপ্তি হল বিশেষণ আর পক্ষধর্মতা হল বিশেষ্য। বিশেষণ জ্ঞান ছাড়া বিশিষ্টের জ্ঞান অসম্ভব। তাই

ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতা জ্ঞানের ঘটক রূপে ব্যাপ্তিজ্ঞানের আলোচনা প্রসক্ত হয়। এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করতে সমগ্র অধ্যায়টিকে কতকগুলি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ লিঙ্গ-লিঙ্গী সম্বন্ধ বিমর্শ

ন্যায় দর্শনে লিঙ্গ-লিঙ্গী সম্বন্ধ 'ব্যাপ্তি' নাম পেয়েছে। তবে দর্শন ভেদে এই সম্বন্ধের নামকরণ যেমন ভিন্ন তেমনই সম্বন্ধটির লক্ষণ ও স্বরূপ নির্বাচন সম্প্রদায়গুলির অবস্থানও ভিন্ন ভিন্ন। অবস্থানগত ওই ভেদ স্পষ্ট করার লক্ষ্যেই এই দ্বিতীয় অধ্যায়টির অবতারণা। এই অধ্যায়ে লিঙ্গ-লিঙ্গী সম্বন্ধ বিষয়ে নাস্তিক জৈন ও বৌদ্ধের দৃষ্টিভঙ্গি যেমন আলোচিত হয়েছে তেমনই প্রাচীন ন্যায় থেকে বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ থেকে মীমাংসা, বেদান্ত এসব আস্তিক্যবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গিও প্রতিফলিত হয়েছে।

এই লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধকে নানাভাবে বর্ণনা করেছেন নানা সম্প্রদায়। বৌদ্ধমতে এ হল অবিনাভাব সম্বন্ধ। বৌদ্ধের মতো জৈন তার্কিকরাও ব্যাপ্তিকে অবিনাভাব বলেছেন। বৈশেষিক দর্শনে স্পষ্টভাবে ব্যাপ্তির পরিচয় প্রদান করা হয়নি বা ব্যাপ্তিবাচক কোনো শব্দের উল্লেখ করা হয়নি। প্রশস্তপাদই বৈশেষিক পরম্পরায় প্রথম ব্যাপ্তিবাচক শব্দের প্রয়োগ করেছেন। ব্যাপ্তিকে বোঝাতে 'বিধি', 'সময়', ও 'সহচারী' শব্দের প্রয়োগ করেছেন তিনি। সাংখ্য দর্শনে ব্যাপ্তিকে ব্যাপ্যব্যাপকভাব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মীমাংসা দর্শনের ভাষ্যকার শবরস্বামী লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধকেই ব্যাপ্তি বলে অভিহিত করেছেন। ব্যাপ্তির পরিচয় দিতে গিয়ে বেদান্ত পরিভাষাকার বলেছেন অশেষ সাধনের আশ্রয়ে আশ্রিত যে সাধ্য তার সঙ্গে হেতুর সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি। এইভাবে লিঙ্গ-লিঙ্গী সম্বন্ধে নানা নামকরণ যেমন দৃষ্ট হয় তেমনই ওই সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা বা গ্রহণ বিষয়েও

ভিন্ন ভিন্ন মতের পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যাপ্তির স্বরূপ ও ব্যাপ্তিগ্রহের ওই উপায়গুলি স্পষ্ট করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ নব্য ন্যায়ে ব্যাপ্তি

ব্যাপ্তির আলোচনা সর্বাধিক ঔৎকর্ষ লাভ করেছে নব্যন্যায়ের গ্রন্থগুলিতে। যদিও পরম্পরাগতভাবে প্রাচীন থেকে নব্য সব আচার্যই ব্যাপ্তি বিষয়ে একটি অভিন্ন চিন্তাধারা বহন করেন, তথাপি ব্যাপ্তির লক্ষণ নিরূপণে নব্য ন্যায়ে এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার ও পরিভাষা ব্যবহারের এত জটিল রীতি অনুসৃত হয়েছে, যা পূর্বাচার্যদের রচনায় পরিলক্ষিত হয়নি। এই নব্য ন্যায়ের শৈশব উদয়নের রচনায় অতিবাহিত হলেও তা যৌবনের দীপ্তি লাভ করে গঙ্গেশ উপাধ্যায়কৃত 'তত্ত্বচিন্তামণিতে'। ওই গ্রন্থে অনুমানচিন্তামণি খণ্ডে 'ব্যাপ্তিবাদ' প্রকরণে ব্যাপ্তি বিষয়ে পূর্বপক্ষীর মত নিরাশের অনন্তর গঙ্গেশ তাঁর স্বকৃত লক্ষণটি উপস্থাপন করেছেন সিদ্ধান্তলক্ষণ পরিচ্ছেদে। এই দুরূহ লক্ষণের ব্যাখ্যা সহজ নয়; তথাপি মণিকারকৃত ওই সিদ্ধান্ত লক্ষণটি অধিগত করার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস হয়েছে গবেষণাকর্মের তৃতীয় অধ্যায়ে। ওই সিদ্ধান্ত লক্ষণের বিচারের অনন্তর বিশ্বনাথ, অন্নংভট্ট প্রমুখ নবীনতর আচার্যদের ব্যাপ্তি লক্ষণও এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। তাই অধ্যায়টির শিরোনাম রাখা হয়েছে "গঙ্গেশ ও নব্যগণের দৃষ্টিতে ব্যাপ্তি"।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ গঙ্গেশ কর্তৃক মীমাংসক সম্মত পঞ্চ ব্যাপ্তিলক্ষণের নিরাকরণ

স্বমত প্রতিষ্ঠা সর্বত্র পরমত খণ্ডনের দাবি রাখে। বিপক্ষ বাঁধন ছাড়া স্বপক্ষ সাধন হয় না। এই বিবেচনা থেকে ব্যাপ্তির সিদ্ধান্ত লক্ষণ প্রদানের পূর্বে মণিকার তাঁর ব্যাপ্তিবাদে ব্যাপ্তি বিষয়ে যে সকল বিকল্প লক্ষণ পূর্বপক্ষীরা পেশ করেন সেগুলি নিরাশে প্রবৃত্ত

হন। তবে লিঙ্গ-লিঙ্গী সম্বন্ধ বিষয়ে যে বহুবিধ লক্ষণ ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রচলিত সেই সকল লক্ষণের আলোচনা বা বিচার তাঁর ব্যাপ্তিবাদে স্থান পায়নি। 'অনৌপাধিক সম্বন্ধ', 'কাৎর্ম্নেন সম্বন্ধ', 'স্বাভাবিক সম্বন্ধ', 'অবিনাভাব সম্বন্ধ', 'সম্বন্ধমাত্র' ইত্যাদি কিছু চিরাচরিত ব্যাপ্তি লক্ষণ বিষয়ে মণিকার তাঁর অনস্থা জ্ঞাপন করলেও সে সব বিষয়ে বিস্তৃত বিচার বা ব্যাখ্যায় অগ্রসর হননি। বরং পূর্বপক্ষী প্রদত্ত যে সকল লক্ষণ ব্যাপ্তির অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য হিসাবে প্রতীয়মান হয় তেমন কিছু লক্ষণ ব্যাখ্যা ও নিরাশ গুরুত্ব লাভ করেছে মণিকারের রচনায়। ওই নিরাকৃত ব্যাপ্তির লক্ষণগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'অব্যভিচরিতত্ব' পদপ্রতিপাদ্য প্রভাকর সম্মত ব্যাপ্তির পাঁচটি লক্ষণ। ওই লক্ষণগুলির বিচার ও খণ্ডন স্থান পেয়েছে এই গবেষণা নিবন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ ব্যাপ্তির সিংহ-ব্যাঘ্র লক্ষণদ্বয় ও তদ্‌বিষয়ে গঙ্গেশের আপত্তি ব্যাখ্যা

মণিকার গঙ্গেশ পূর্বপক্ষী সম্মত ব্যাপ্তির যে সকল লক্ষণ পরিহার করেছেন সেগুলির মধ্যে 'অব্যভিচার' পদপ্রতিপাদ্য পঞ্চ লক্ষণ যেমন রয়েছে তেমনই 'সিংহ-ব্যাঘ্র' লক্ষণ রূপে পরিচিত ব্যাপ্তির দুটি লক্ষণও রয়েছে। এই দুটি লক্ষণ হল- ১) সাধ্যাসামানাধিকরণ্যানধিকরণত্বম্, ২) সাধ্যবৈয়ধিকরণ্যানধিকরণত্বম্। লব্ধ তথ্যপ্রমাণ অনুসারে ওই লক্ষণ দুটি মিথিলার দুই নৈয়ায়িক শশধর ও মণিধরের। প্রবল পরাক্রমশালী বিদ্বান এই দুই নৈয়ায়িক যথাক্রমে 'সিংহ-ব্যাঘ্র' নামে আখ্যায়িত হতেন। তাই তাদের লক্ষণগুলি 'সিংহলক্ষণ' ও 'ব্যাঘ্রলক্ষণ' নামে পরিচিতি পায়। এই দুই লক্ষণের ব্যাখ্যা ও বিচার আলোচ্য অধ্যায়ের মুখ্য উপজীব্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন অভাব-ঘটিত চতুর্দশ লক্ষণ বিচার

‘অব্যভিচরিতত্ব’ হিসাবে পরিগণিত ব্যাপ্তির পঞ্চবিধ লক্ষণ এবং ‘সিংহ-ব্যাঘ্র’ লক্ষণদ্বয়ের বিরুদ্ধে গঙ্গেশ একটি সাধারণ আপত্তি পেশ করেন। আপত্তিটি এই যে, কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতির ক্ষেত্রে- যেখানে সাধ্যাভাবাধিকরণ, সাধ্যাসামানাধিকরণ কিংবা সাধ্যবৎপ্রতিযোগিক ভেদের অধিকরণ সিদ্ধ নয়, সেখানে ওই ব্যাপ্তির লক্ষণগুলি অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হয়। এরূপ আপত্তির মোকাবিলায় সৌন্দড় উপাধ্যায় একপ্রকার অভাবের কল্পনা পেশ করেন। ওই অভাবটি পণ্ডিতকুলে পরিচিত ‘ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকঅভাব’ হিসাবে। সৌন্দড়ের দাবি, ওইরূপ অভাবের সম্ভাবনা স্বীকার করলে কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতির ক্ষেত্রে সাধ্যাভাবাধিকরণ আর অপ্রসিদ্ধ হয় না; ফলে ‘সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্’ ইত্যাদি পঞ্চ লক্ষণের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অব্যাপ্তির আপত্তিও অবশ্যম্ভাবী হয় না। বিষয়টিকে স্পষ্ট করতে গিয়ে দীধিতিকার রঘুনাথ শিরোমণি সৌন্দড় সম্মত ব্যাপ্তির দুটি লক্ষণের অবতারণা করেন যেগুলি ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন অভাবের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। সৌন্দড় পণ্ডিতকে অনুসরণ করে ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকঅভাবের ধারণাকে মান্যতা দিয়ে রঘুনাথ যেমন দুটি লক্ষণের বিস্তার ঘটিয়েছেন তেমনই পরবর্তী আচার্যদের অনেকেই ব্যাপ্তির বিকল্প লক্ষণ পেশ করেছেন যাদের মধ্যে চক্রবর্ত্তী, প্রগল্‌ভাচার্য, মিশ্র ও সার্ব্বভৌম প্রদত্ত তিনটি করে লক্ষণ রয়েছে। সর্বমোট ওই চতুর্দশ লক্ষণের উল্লেখ বা বিচার অনুমানচিন্তামণিতে দৃষ্ট হয় না। তবে দীধিতিকার রঘুনাথ তাঁর রচনায় এই চতুর্দশ লক্ষণের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। তিনি দেখান যে যুক্তিতে মণিকার গঙ্গেশ সৌন্দড় কল্পিত ওই ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নঅভাবের ধারণাকে খণ্ডন করেন তা গ্রহণ করলে ওই চতুর্দশ

লক্ষণের কোনটিই আর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। দীধিতি গ্রন্থে উল্লিখিত ওই চতুর্দশ লক্ষণ বিচার এবং নিরাশ স্থান পেয়েছে এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে।

উপসংহার

অন্তিম অধ্যায়টি এই গবেষণা নিবন্ধের উপসংহার। এই উপসংহার অংশে মূলত যে সকল যুক্তিতে গঙ্গেশ উপাধ্যায় পূর্বপক্ষী প্রদত্ত ব্যাপ্তির লক্ষণ সমূহ নিরাকরণ করেছেন সেইসব যুক্তির সারবত্তা খতিয়ে দেখা হয়েছে। উল্লেখ্য যে গঙ্গেশ 'অব্যভিচরিতত্ব' পদপ্রতিপাদ্য পঞ্চ লক্ষণ ও 'সিংহ-ব্যাঘ্র' লক্ষণদ্বয়ের বিরুদ্ধে একটি সাধারণ আপত্তি করেন। আপত্তিটি হল, কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতিস্থলে ওই লক্ষণগুলির সমন্বয় হয় না। এখন প্রশ্ন হল কেবলান্বয়ী সাধ্যক যে অনুমিতির কথা মণিকার উত্থাপন করেছেন তা'কি বৈধ অনুমিতি? এবিষয়ে সংশয়ের যথেষ্ট অবকাশ আছে; কেননা গঙ্গেশ পরবর্তী নব্যদের অনেকে ওই ধরনের অনুমিতির ক্ষেত্রে অনুপসংহারী হেত্বাভাসের সম্ভাবনা মেনে নিয়েছেন। এমতাবস্থায় অসদ্ধেতুক অনুমিতিতে কোনো ব্যাপ্তি লক্ষণের সমন্বয় হয় না বলে আপত্তি তোলা কতখানি সঙ্গত সে প্রশ্ন থেকে যায়। এই আপত্তি যদি যথার্থ না হয় তাহলে গঙ্গেশ কর্তৃক ওই সপ্তবিধ লক্ষণের খণ্ডন এবং বিকল্প হিসাবে সিদ্ধান্তলক্ষণ গঠন দুইই নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায়। এই উভয় সংকটের সম্যক্ পরিচয় যেমন এই অন্তিম অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে, সেই সঙ্গে সংকটটির সম্ভাব্য সমাধানও সন্ধান করা হয়েছে এই উপসংহার অংশে।

দেখানো হয়েছে কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতির যথার্থতা বিষয়ে যে আশঙ্কা পূর্বপক্ষী করতে পারেন তার মোকাবিলায় বিকল্প সমাধান বিশ্বনাথকে অনুসরণ করে দেওয়া সম্ভব। বিশ্বনাথ তাঁর 'ভাষাপরিচ্ছেদ' গ্রন্থে 'অব্যভিচরিতত্ব' পদপ্রতিপাদ্য

লক্ষণের সূচনা করতে গিয়ে ‘‘সাধ্যবদন্যস্মিন্ অসম্বন্ধ’’- এর কথা বলেছেন আর এই লক্ষণের বিরুদ্ধে অব্যাপ্তির আপত্তি তুলতে গিয়ে দুটি স্থলের উল্লেখ করেছেন। প্রথমে একটি কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতির (ঘটো অভিধেয়ঃ প্রমেয়ত্বাৎ) উল্লেখ করে প্রস্তাবিত লক্ষণের বিরুদ্ধে অব্যাপ্তি প্রদর্শন করেছেন তিনি। অনন্তর ‘সত্তাবান্ জাতেঃ’ এইরূপ একটি অনুমিতির স্থলে উক্ত লক্ষণটির অব্যাপ্তি দেখিয়েছেন। যেটি কেবলান্বয়ী সাধ্যক অনুমিতি বলে বিবেচিত হয় না। এইভাবে কেবলান্বয়ী সাধ্যক অনুমিতির ক্ষেত্রে অব্যাপ্তির আপত্তি উত্থাপন না করেও যে পঞ্চ লক্ষণের নিরাশ ঘটানো যায় তা ইঙ্গিত করেছেন ভাষাপরিচ্ছেদকার। মণিকার উত্থাপিত অব্যাপ্তির আপত্তি যে অমূলক নয় বিশ্বনাথকে অনুসরণ করে তা প্রদর্শন করাই এই অধ্যায়ের লক্ষ্য।

গ্রন্থপঞ্জী

- অকলঙ্ক, *অকলঙ্কগ্রন্থত্রয়ম্*, ন্যায়াচার্য পণ্ডিত মহেন্দ্র কুমার শাস্ত্রী (সম্পাঃ), আহমেদাবাদ, সরস্বতী পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৬।
- অনন্তবীর্য, *প্রমেয়রত্নমালা (মাণিক্যনন্দী নন্দী প্রণীত পরীক্ষামুখসুত্র লঘুবৃত্তিঃ সহ)*, পণ্ডিত শ্রী হীরালাল জৈন (সম্পাঃ), বারাণসী, ১৯৬৪।
- অন্নংভট্ট, *তর্কসংগ্রহ (নীলকণ্ঠী দীপিকা সহিত)*, পণ্ডিত শিবদত্তন (সম্পাঃ), মুম্বাই, ১৯৫৪।
- গঙ্গেশোপাধ্যায়, *ব্যাপ্তিপঞ্চক*, রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ (অনুঃ ও সম্পাঃ), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১১।
- গদাধর ভট্টাচার্য, *তত্ত্বচিন্তামণি দীধিতিবিবৃত্তি*, শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ (সম্পা.), কলকাতা, এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯১০।